রবীন্দ্রনাথ ও এজরা পাউন্ড

স্বরাজ সেনগুপ্ত

।। এক ।।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এজরা পাউন্ডের সম্পর্ক নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই, বিশেষ করে এজরা পাউন্ড রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তিতে কতটা সাহায্য করেছিলেন, তাঁর রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রথমে অসীম উৎসাহ ও পরে শীতল মনোভাব পরশ্রীকাতরতার নামান্তর কিনা, এ সব নিয়ে বাদানুবাদের উপশম হয়নি এতকাল পরেও। তাই দেখি কিছুকাল আগে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'চিঠিপত্র' স্তম্ভেও এই প্রসঙ্গ নতুন করে তোলা হয়েছে কিছুদিন আগে যে কবি ডাবলু বি ইয়েট্‌স্ ও এজরা পাউন্ড রবীন্দ্রনাথের প্রতি পরবর্তীকালে বিরূপ হয়েছিলেন মূলত ঈর্ষাভরে, তাঁর কাব্যের উৎকর্ষের অভাববোধের জন্য নয়। এ বিতর্কের ওপর নতুন করে আলোকপাত হতে পারে তখনই যদি আমরা বিচার করি এই দুই কবির পারস্পরিক সম্পর্ক তাঁদের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে, তাঁদের কাব্যের শিল্পগত যাথার্থ্যে এবং আজকের সাহিত্যের মানদন্ডে তাঁদের কবিতার সার্বিক মূল্যায়নে। নইলে এ শুধু পুরাতন চর্বিতসার ভরে এবং দুপক্ষের বদ্ধমূল ধারণাকে দৃঢ়তরই শুধু করবে, নতুন কোন প্রশ্ন উত্থাপন করবে না বা ঘটনার নতুন বিশ্লেষণ দ্বারা এ বিতর্কের মীমাংসায় সাহায্য করবে না।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এজরা পাউন্ডের সম্পর্ক বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে এই দুই কবির বিমানস, জীবনের প্রতি তাঁদের পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও সর্বপ্রকার স্থিতাবস্থার প্রতি তাঁদের প্রবল উপেক্ষা। রবীন্দ্রনাথ ও এজরা পাউন্ড দুজনেই হলেন আন্তর্জাতিক কবি। সতেরো বছর বয়সে ইংলন্ডে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সেই যে ইওরোপীয় সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় হল, তারপর থেকেই তাঁর মানসচেতনা প্রাদেশিকতার সীমাবদ্ধ গন্ডি অতিক্রম করে বিশাল বিশ্বে পরিভ্রমণ করেছে এবং বহুবার বিদেশ যাত্রার ফলে যা আরও বিস্তার লাভ করেছে। তাই সর্বদাই তিনি মনে করেছেন যে, আমি তাঁর আসন, পৃথিবীর সব কিছুই তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু ও সবার কাছেই প্রসারিত তাঁর কবিতার আবেদন। আবার রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতা মিশ্রিত হয়ে তাঁর প্রাণ একদিকে যেমন কাঁদে কানাগলির বাসিন্দা হরিপদ কেরাণী ও পলাতকা মেয়ে মঞ্জুলিকার জন্য, মিনতি করে শরৎচন্দ্রকে সাধারণ বাঙালি মেয়ের জন্য একটি গল্প লিখতে, তেমনি ক্ষোভের আগুনে জ্বলে ওঠে শোষিত আফ্রিকা বা ফিনল্যান্ডে বোমার ঘায়ে নিহতদের কথা স্মরণ করে।

এজরা পাউন্ডও মনেপ্রাণে আন্তর্জাতিক কবি। একুশ বছর বয়সে সেই যে আমেরিকা ছেড়ে স্বল্পদিনের জন্য স্পেন ও ইতালি ঘুরে লন্ডনে এসে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর একমাত্র স্বপ্ন কি করে ইংরেজি কবিতাকে তৎকালীন জর্জীয় কবিতার একঘেয়েমি থকে মুক্ত করে নতুন ভাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন, কি করে আমেরিকান কবিতাকে শৈশবের অস্থিরতা থেকে উদ্ধার করে যৌবনের তেজস্বিতায় উদ্দীপিত করবেন। আমেরিকান কবিতার তখন নাবালক অবস্থা, আর ইংলন্ডে তখনও জর্জীয় ভঙ্গিমার এমন প্রতিপত্তি যে, এই সব কবি শহরের ডেস্কে বসেই গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য করতেন অশ্রুপাত। পাউন্ড লন্ডনে পৌঁছবার আগেই দুটি কবিতার বই বার করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নতুন সুর পেলেন ১৯০৯ সালে

প্রকাশিত তাঁর 'Personae' কাব্যগ্রন্থে, যার সমালোচনায় The Bookman —পত্রিকা লিখল ঃ
"No new book of poems for years had contained such a freshness of inspiration, such a strongly individual note, or been more alive with indubitable promise."

ফলে রাতারাতি খ্যাতি অর্জন করলেন এজরা পাউন্ড কবি হিসেবে, যখন তাঁর বয়স চবিবশ বছরেরও কম। লন্ডনে তিনি এসেছিলেন বিনা পরিচয় পত্রে বা পরিচিত জনের সূত্রে, পকেটে ছিল মাত্র তিন পাউন্ড, শুধু সম্বল ছিল অদম্য উৎসাহ ও অশেষ কবিতাপ্রীতি। কিন্তু শুধু নতুন ভঙ্গিতে কবিতা লেখাই নয়, পাউন্ডের প্রধান লক্ষ্য ছিল নতুন কবিতা আন্দোলনের, এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে অন্য কবিরা উজ্জীবিত হতে পারেন, তাঁদের সাহিত্য - মানস স্ফূর্ত হতে পারে। তাই অ ামেরিকার 'Poetry'পত্রিকার তিনি প্রথম বিদেশী প্রতিনিধি হয়েছিলেন, প্রথম কয়েক বছর নিয়মিত লন্ডন থেকে নিজের কবিতা ছাড়া অন্য কবিদের কবিতাও সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন, পরে অসংখ্য লিট্‌ল ম্যাগাজিন-এর পৃষ্ঠপোষক হয়ে উৎসা হিত করেছেন নতুন সাহিত্যিক দলকে। কিন্তু এত সব করেও মনের এক কোণে সব সময়েই অধিকার করে ছিল আমেরিকা, জন্মস্থান আইডাহোর 'ফ্রন্টিয়ার ম্যান'-এর মুক্তপ্রাণের উল্লাস, সেই ক্ষ প্রেইরীভূমির আকাশছোঁয়া প্রসারতা এবং স্ব দেশের প্রতি প্রবাসজীবনের বিষণ্ন আকুলতা।

রবীন্দ্রনাথের মতো এজরা পাউন্ডও সঙ্গীত প্রেমিক। কবিতার সঙ্গে সঙ্গীতের একাত্মতা প্রথম থেকে বুঝতে পেরেছিলেন যার ফলে তিনিলিখেছেন ঃ "Poetry is a composition of words set to music….. Poets who are not interested in music, are, or become bad poets. Poets who will not study music are defective."
রবীন্দ্রনাথের কাছেও গান তো তার অস্তিত্বের নিশ্বাস বায়ু চেতনার রঙ, আত্মার আহার। নিজে যে শুধু অনন্যসঙ্গীত শিল্পী ছিলেন তাই নয়, সারাজীবন ধরে রচনা করেছেন অসংখ্য গান, গেয়েছেন অনবদ্য গায়কীতে। কিশোর বেলায় সেই যে প্রথম প্রভাত-পাখির গান শুনে তাঁর বালক জীবনের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছিল, তারপরে তিনি সহস্র গান রচনার অন্তেও জীবন-স ায়াহে শেষ পারানির কড়ি হিসেবে বেছে নিয়েছেন গানকেই। 'সঙ্গীত ও কবিতা' প্রবন্ধে তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ 'আম াদের ভাবপ্রকাশের দুটি উপকরণ আছে - কথা ও সুর। কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ করে, সুরও প্রায় ততখানি ভাবপ্রকাশ করে..... সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে। কবিতা ও সঙ্গীতে আর কোন তফাৎ নাই, কেবল ইহা ভাবপ্রকাশের একটি উপায়, উহা ভাবপ্রকাশের আর একটা উপায় মাত্র।'

রবীন্দ্রনাথের মতোই পাউন্ডও স্থিতাবস্থার বিরোধী, গতানুগতিকতার তালে জীবন ভাসিয়ে চলা তাঁদের রক্তের মধ্যে একেব ারেই অনুপস্থিত, কবিতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে পাউন্ড 'ইমেজিস্ট' স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা যার মূল লক্ষ্য ছিল একটুকরো দৃশ্যের দর্পণে সমস্ত পৃ-থিবীকে উদ্ভাসিত করা। কবিতাকে তিনি সর্বপ্রকার অলঙ্কারবাহুল্য থেকে মুক্ত করে লিরিকের স্বাভাবিকতার মধ্যে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, বিভিন্ন ভাষার শব্দ-তরঙ্গের মধ্যে প্রসারিত হতে চেয়েছেন। আর রবীন্দ্রনাথ বাংলা সা হিত্যের সব কিছু বিবর্তনের হোতা। বাংলা কবিতাকে সকল ছন্দের কাকার্যে ভূষিত করেও শেষ জীবনে গদ্যকবিতায় হাত দিয়েছেন, ছোট গল্পের মাধ্যমে জীবনের একান্ত কথাও ব্যক্ত করেছেনে, বাঙ্‌ময় ভাষায় প্রবন্ধের ভাষাকে নীতিবাদের কচকচা নি থেকে মুক্ত করে প্রকাশ করেছেন সরস গতিশীলতায়। তাই ধূর্জটি মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন যে, 'After him, it is impossible to write bad verse and ineffective prose in Bengal.'

আবার রবীন্দ্রনাথ যেমন আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ধার ধারেননি, পড়াশুন া করেছেন নিজের প্রাণের তাগিদে, প্রকাশের তাড়ন ায়, এজরা পাউন্ডও তেমনি কলেজের বাঁধাবদ্ধ পড়াশুনোর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেন নি। অবস্নাতক অবস্থায় পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য পড়াশুনো না করার ফলে তাঁকে সেখান থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল, যদিও পরে হ্যামিল্টন কলেজ থেকে বি.এ ডিগ্রি নিয়ে আবার এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই এম.এ ডিগ্রি পেয়েছিলেন। কিন্তু কলেজে পাঠরত অবস্থা থেকেই পাউন্ড জানতেন যে, তিনি কবি হবেন, হবেন নতুন কাব্যের দিশারী।

যদিও রবীন্দ্রনাথের জীবনের ক্রমবিবর্তন আমাদের বিস্মিত ও অভিভূত করে, তা হলেও সেই অপেক্ষাকৃত প্রথম বয়সে যখন তিনি 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন তখন থেকেই তাঁর জীবনের লক্ষ্য স্থির হয়ে গিয়েছিল, তখন থেকেই তিনি ঠিক করেছিলেন যে আজন্ম সাহিত্য সাধনা করবেন, বিশেষ করে কবিতা রচনায় উৎসর্গ করবেন বাকি জীবন। এত বড় সৃষ্টিশীল জীবনে যদিও অনেক বাধা এসেছে, কর্মের উৎসাহ অনেক দিকেই পরিব্যাপ্ত হয়েছে, কিন্তু কবিতার ধারা ঠিক নিরবচ্ছিন্নভাবেই প্রবাহিত হয়েছে শেষদিন পর্যন্ত। পাউন্ডের জীবনেও কবিতা প্রধান মূলমন্ত্র, সংসার-জীবনের প্রধান উপজীব্য। যখন চোখের থেকে সব স্বপ্ন অদৃশ্য হয়েছে, যখন অত্যাচারে অনাহারে প্রাণের সব উদ্দীপনাই নির্বাপিত হয়েছে, যখন সারা পৃথিবী বিমুখ হয়ে তাঁর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে, তখনও তিনি তাঁর 'ক্যান্টোস' লিখে চলেছেন এক মনে, জীবনভূমির শেষ ফসল হিসেবে যা উপহার দিয়েছেন ঋিজনকে।

রবীন্দ্রনাথের মতো এজরা পাউন্ডও ছিলেন মনেপ্রাণে শিক্ষক, যদিও তাঁর এই প্রতিভার ব্যবহারের বিশেষ কোন সুযোগ পাননি, শুধু জীবনের প্রথম দিকে লন্ডনের পলিটেকনিক ইনস্টিট্যুটে ছয় বছর পড়ানো ছাড়া। কিন্তু যাঁরাই পাউন্ডের সাহচর্যে এসেছিলেন, তাঁরাই দেখেছেন যে, তাঁর মন ছিল শিক্ষকের, অন্যকে গড়ে পিঠে স্বাধীন মনোভাবাপন্ন করে তোলা ছিল তাঁর তীব্র আকাঙক্ষা। তাই তিনি টি.এস. এলিয়টের কবিতাকে মার্জনা করেছেন, ইয়েটস-এর কবিতাকে অন্যখাতে প্রবাহিত করতে সাহায্য করেছেন, ফ্রস্ট ও কামিংস-এর কবিতাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেছেন। আর রবীন্দ্রনাথ দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার দীনতা বুঝতে পেরে নিজে মনের মত স্কুল স্থাপন করেছেন, নিজের সেখানে কবিতা পড়িয়েছেন, শান্তিনিকেতনের বীজমন্ত্র সযত্নে প্রোথিত করেছেন যা কালক্রমে ব্যাপ্ত হয়েছে ঋিভারতীরূপে - 'যত্র ঋিঃ ভবতি একনীড়ম্'।

কিন্তু এই দুই প্রতিভার মধ্যে বৈপরীত্যের পরিমানও কম নয়। রবীন্দ্রনাথ হলেন বটবৃক্ষের মত স্থিতধী, প্রাচীন ভারতবর্ষের ধ্যান তাঁর চিত্তে, যেমন চোখে তাঁর নতুন ভারতের স্বপ্ন। সেখানে ক্ষণিকের উন্মাদনা বা চপল হাততালি তাঁকে বিচলিত করেনি। কিন্তু এজরা পাউন্ড হলেন অস্থির, দূরন্ত তারকা। নতুনত্বের প্রতি তাঁর উৎসাহ ক্ষণকালের জন্য, তারপর আবার কোনো নতুনতর তারকার প্রতি তাঁর মন অসীম আগ্রহে ধাবমান।

এজরা পাউন্ডের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্টাইল বা রচনাশৈলীর পার্থক্যও কম নয়। পাউন্ড হলেন কাব্যে 'ইমেজিস্ট' স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা যা তাঁর মতে তিনটি প্রধান নিয়ম মেনে চলবে ঃ (১) প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রয়োগ করতে হবে, তা সে ভাবগত বা বস্তুগত যাই হ'ক না কেন, (২) এমন কোন শব্দ ব্যবহার করা চলবে না যা বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে সাহায্য না করে, এবং (৩) ছন্দের ব্যাপারে সাঙ্গীতিক শব্দের অনুবর্তিকায় কবিতা রচনা করতে হবে, তালের অনুক্রম অনুসারে নয়। পাউন্ডের ভাষায় "Use no superfluous word, no adjective which does not reveal something."

কবিতা রচনায় ভাষার অনলঙ্কৃত ও যথাযথ প্রয়োগ সম্বন্ধে এজরা পাউন্ডের এই আন্দোলন ইংরেজি কাব্যে নতুন দিঙ্‌নির্ণয় করল। কিন্তু এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রয়োগবিধি হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত। বুদ্ধদেব বসু যেমন বলেছেন, আমরা বাঙালীরা এমনিই মেটাফর দিয়ে কথা বলি, আর রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তো এই মেটাফর-এর ছড়াছড়ি। তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতার এত অলঙ্করণ, এত দ্ব্যর্থক শব্দপ্রয়োগ। তাঁর কবিতায় 'তুমি' বলতে যেমন তিনি প্রিয়তমকে বুঝিয়েছেন তেমনি ঈশ্বরকেও সম্বোধন করেছেন একই সঙ্গে। 'প্রভু' বলতে যেমন শাসককে বুঝিয়েছেন, তেমনি তা আরোপিত করেছেন তাঁর জীবনদেবতাকেও।

তেমনি আবার পাউন্ডের মত ছিল জাতিবিদ্বেষী, বিশেষ করে ইহুদি বিদ্বেষে ভরা। আমেরিকায় থাকাকালীন জীবনের প্রথম অবস্থা থেকেই এই সমাজে ইহুদীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তিনি বিদ্বিষ্ট হয়েছিলেন, ইউরোপে গিয়ে তা বৃদ্ধি পেল হাজার গুণ। এখানে শুধু পাউন্ডই নন, অনেক প্রসিদ্ধ লেখকই এই কলঙ্কে কলঙ্কিত। তাই জ্যাঁ পল সার্তর দুঃখ করে বলেছিলেন, 'এই এক রোগ, যা একবার রক্তের ভেতরে গেছে, তা থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন।' কিন্তু পাউন্ডইহুদীদের জাতি

হিসেবে ঘৃণা করতেন, ব্যক্তিগত হিসেবে নয়। সেখানে তাঁর অনেক বন্ধুই ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। তাই ১৯৩৪ সালে তঁার 'Guide to Kulchur'বইটি যেমন ইহুদী কবি লুই জুকফস্কিকে উৎসর্গ করেছেন, তেমনি তিনিই আমেরিকানদের মধ্যে প্রথম যিনি জার্মান-ইহূদী কবি হেইনরিখ হাইনের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। সেই একই সময়ে আবার সম্পাদিকা হ্যারিয়েট মনরোকে চিঠি লিখে ইহূদী জাতিকে গালাগাল দিয়েছেন ঃ "Damn remnants in you of Jew religion, that bitch Moses and the rest of the tribal barbarians."

কিন্তু হিংসা বা বিদ্বেষ রবীন্দ্রনাথের শরীরে কোনোদিন ছিল না। ব্রাহ্মধর্মের সমভ্রাতৃত্বের মন্ত্রে সেই যে ছেলেবেলায় দীক্ষিত হয়েছিলেন, জীবনের কোনোদিন তা থেকে বিচ্যুত হননি। তাই নিন্দা, আঘাত, মানুষের হীনম্মন্যতা সব সহ্য করেছেন নীরবে, তা সে স্বদেশ বা বিদেশবাসীরই হোক। যৌবনে যখন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁকে 'পায়রা কবি' বলে ব্যঙ্গ করেছেন, তার বিদ্ধে তিনি কোনো কটু বাক্য ব্যবহার করেননি। পরবর্তী জীবনে অনেক বন্ধুজনের বিরূপ ভাষণও নীরবে শুনেছেন, কিন্তু কখনো তাঁদের সম্বন্ধে অপ্রিয় কথা উচচারণ করেননি, সে ব্যথা যতই দুর্বিষহ হ'ক, সে বাক্য যতই কঠিন হ'ক। মনে রেখেছেন পুরনো পরিচয়ের মধুর সুবাস, ফেলে আসা দিনগুলির উজ্জ্বল স্মৃতি। তাই জীবন সায়াহে ইয়েটস যখন অনুযোগ করে চিঠি লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তখন সে সব বিতর্ক পরিহার করেই উত্তর দিয়েছিলেন যার মর্মার্থ হল ঃ 'হে বন্ধু আছো তো ভালো। তোমার পথ আজ আমার পথের থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, তাই এখন আর সেই সব বিতর্ক থাক, এসো স্মরণ করি সেই প্রীতিমুগ্ধ দিনগুলি - লন্ডনে তোমার সেই মনোরম বাসাটির কথা'।

।।দুই ।।

১৯১২ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথের ইংলন্ড যাত্রা সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা, কারণ এই সময়েই তাঁর কবিতা ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে সত্যিকারের ঋিসাহিত্যের দ্বারে গিয়ে পৌঁছল। শিল্পী উইলিয়াম রদেনস্টাইনের সাহায্যে কবি ডবলিউ. বি. ইয়েটস, আর্নেস্ট রাইস, এজরা পাউন্ড ও মে. সিক্লেয়ার-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল সেই প্রথম এবং ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের নিজকৃত গীতাঞ্জলির কবিতাগুলির ইংরেজি তর্জমা পড়ে এত অভিভূত হয়ে পড়লেন যে, তিনি পাউন্ডকে বললেন যে, রবীন্দ্রনাথ "was greater than any of us — I read these things and wonder why one should go on trying to write."

পরে রবীন্দ্রনাথের "The Banyan Tree" কবিতার /Two ducks swam by the weedy margin above their shadows, and the child… longed… to float like those ducks among the weeds and shadows."লাইনগুলি পড়ে ইয়েটস বললেন, "Those ducks are the ducks of real life and not out of literature" । সাতই জুলাই (১৯১২)-এর সেই সাহিত্যসভায় এজরা পাউন্ডও উপস্থিত ছিলেন যখন ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের ইংরেজিতে অনূদিত কবিতাগুলি তাঁর সুরেলা প্রাণবন্ত গলায় একের পর এক আবৃত্তি করেছিলেন। পরের দিনই পাউন্ড উত্তেজিত অবস্থায় আমেরিকার 'পয়েট্রি', ম্যাগাজিনের সম্পাদিকা হ্যারিয়েট মনরোকে লিখলেন "This is The Scoop. Reserve space in the next number for Tagore… He has sung Bengal into a Nation."

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এজরা পাউন্ডের এই সময়ের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে আমাদের দেশে একটি ধারণা আছে যে পাউন্ড তখন এক অজ্ঞাত, অখ্যাত কবি এবং যখন তখন রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে তার পায়ের কাছে বসে থাকতেন। এই ধারণা সৃষ্টির মূলে অন্যতম ব্যক্তি হলেন রবীন্দ্রনাথের শিল্পীবন্ধু উইলিয়াম রদেনস্টাইন যিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন ঃ The young poets come to sit at Tagore's feet; Ezra Pound the most assiduously."কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন পাউন্ডের পরিচয় হয়, তখন তিনি রীতিমতো খ্যাতনামা কবি। প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় শুধু কবি হবার বাসনায় এজরা পাউন্ড ইংলন্ডে এসে এতদিনে চারটি কবিতার ও একটি প্রবন্ধের বই প্রকাশ করেছেন, বিশেষ করে 'Personae' কাব্যগ্রন্থে তাঁর স্বকীয় ও নতুন কণ্ঠকে সবাই স্বাগত জানিয়েছেন। ততদিনে তিনি ইয়েটস-এর অনুগত বন্ধু ও তাঁর কবিতার নন্দনতা

ত্বিক মোড় ঘুরিয়ে ভিন্ন খাতে চালাতে সাহায্য করেছেন। লন্ডনে পার্সি স্ট্রীটে নিজের দল গড়েছেন 'দি পোয়েটস ক্লাব' ন ামে যা প্রতি বুধবার সন্ধেবেলায় মিলিত হত। শিকাগোর 'পোয়েট্রি' কবিতা পত্রিকার তিনি হলেন প্রধান হোতা। তাই একথা কখনো বলা যায় না যে, পাউন্ড অপরিচিত ও ইংলন্ডের সাহিত্য সমাজে এক নগণ্য জন। কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠ াকুরের স্মৃতিকথায়ও এই মনোভাব দেখি যখন তিনি লেখেন যে পাউন্ড রবীন্দ্রনাথকে master বা গু জ্ঞান করতেন।

কিন্তু এই সময়কার লেখা এজরা পাউন্ডের পত্রাদিতে দেখি রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অন্য মনোভাব যা সহমর্মী, গু-শিষ্যের নয়। তাই যখন পাউন্ডের প্রচেষ্টায় 'পোয়েট্রি' পত্রিকার ১৯১২ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় ইয়েটস-এর তিনটি ও রবীন্দ্রন াথের ছ'টি কবিতা প্রকাশিত হল, পাউন্ড তখন দু-পৃষ্ঠায় 'Tagore's Poems' বলে ভূমিকায় লিখলেন ঃ

"The Bengali brings to us the pledge of a calm which we need over much in an age of steel and machines. It brings a quiet proclamation of the fellowship between man and the Gods; between man and nature… I speak with all gravity when I say that world fellowship is nearer for the visit of Rabindranath Tagore of London."

আর ইয়েটস সম্পর্কে লিখলেন (১৯১৩ সালের জানুয়ারি সংখ্যা) ঃ "I find Mr. Yeats the only poet worthy of serious study. Mr. Yeat's work is already a recognized classic and is part of the required reading in the sorbonne. There is no need of proclaiming him to the American people."

কিন্তু তখনও তিনি ভক্তিতে গদগদ নন, ভক্তের বিহ্বল চোখে রবীন্দ্রনাথকে দেখেননি, বরঞ্চ সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিচার করেছেন। তাই 'পোয়েট্রি' পত্রিকার সম্পাদিকা হ্যারিয়েট মনরোকে লেখা তাঁর ২২শে এপ্রিল (১৯১৩)-এর চিঠিতে দেখিঃ

"Dear H.M. : God knows I didn't ask for the job of correcting Tagore., He asked me to. Also it will be very difficult for his defenders in London if he takes to printing anything except his best work."

এজরা পাউন্ডের স্বভাবই হল এই। যখন তিনি যার সম্পর্কে উচ্ছসিত, তখন তাঁর সম্বন্ধে লিখে, বক্তৃতা করে, সব রকম ভ াবে প্রচার করে তাঁর প্রাপ্য মূল্যায়নে সাহায্য করবেন যা এর আগে ইয়েটস সম্পর্কে করেছেন এবং পরবর্তীকাল টি.এস. এলিয়ট ও জেমস জয়েস সম্পর্কে করেছেন। এখন তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন । শুধু যে 'পোয়েট্রি' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি কবিতাপ্রকাশের ব্যবস্থা করলেন তাই নয়, ''ফোর্ট-নাইটলি রিভিউ'' পত্রিকার মার্চ (১৯১৩) সংখ্যায় এক বিরাট প্রবন্ধ লিখে রবীন্দ্রনাথের কবিতার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা করলেন। এবং পরে তাঁর ''দি গার্ডনার'' কাব্যের সমালোচনা 'দি ফ্রি উওম্যান' পত্রিকায় প্রকাশ করে লিখলেন ঃ

"I think what I am trying to say about those poems is that one must read each poem as a whole and then reconceived it as a song, of which you have half-forgotten the cords. You must see them not as you see stars on a flag, but as you have seen stars in the heaven."
এই সময়েই ইয়েটস-এর কবি বন্ধু টমাস স্টার্জমোর রবীন্দ্রনাথকে তাঁর কবিতার ইংরেজি অনুবাদে সাহায্য করছিলেন, যে কাজে ইয়েটস নিজেও কিছুটা অংশগ্রহণ করেছিলেন, মূলত নির্বাচন ও পরিশীলনের কাজে, কবিতার ইংরেজি অনুবাদে নয়। তারপর যখন রদেনস্টাইনের নেতৃত্বে লন্ডনের 'ইন্ডিয়া ক্লাব' ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের 'Gitanjali ' প্রথম প্রকাশ করে, তখন ইয়েটস তার ভূমিকা লিখে স্বাগত জানালেন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে ঃ /The work of a supreme culture, they yet appear as much the growth of the common soil as the grass and the rushes. "

সেই বছরের (১৯১২) অক্টোবর মাসে রবীন্দ্রনাথ যখন ইংল্যান্ড ছেড়ে আমেরিকায় ইলিনয় রাজ্যের আর্বানা শহরে

এলেন, তখন পাউন্ডতাঁকে আরো ইংরেজিতে অনূদিত কবিতা পাঠাতে বললেন এবং লিখলেন যে " My father sends his appreciation of yourpoems" উত্তরে রবীন্দ্রনাথ আর্বানা থেকে তাঁর কবিতার ইংরেজি তর্জমা পাঠিয়ে ৫ই জানুয়ারি (১৯১৩) লিখলেন ঃ I send you the recent translations that I made here. I am not at all strong in my English grammar – please do not hesitate to make corrections when necessary. Then again I do not know the exact value of your English words. Some of them may have their souls worn out by constant use and some others may not have aquired their souls yet. So in my use of words there must be lack of proportion and appropriateness perhaps, that also could be amended by friendly hands.

তারপর পাউন্ডযখন রবীন্দ্রনাথকে তাঁর 'Personae' কাব্যগ্রন্থের এক কপি পাঠালেন, তাই পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ঃ

"Your muse (Pardon me for using this Phrase) has come out, clothed in her own youthful body, full of life, vigour, and suggestive of incalculable possibilities of growth."

এ হল দুই কবির পারস্পরিক গুণাবধারণ, শিষ্যের প্রতি উপদেশাবলী নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতার 'মিস্টিসিজ্‌ম্‌' নিয়ে ইওরোপীয় মহলে যে হইচই দেখা দিল, ইয়েটস-এর মতো পাউন্ডও তাতে যোগ দিতে পারলেন না। তারপর যখন রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে নভেম্বর মাসে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তখন পাউন্ডবললেন যে, এ হল ঃ

"a damn good smack for the British Academic Committee, who had turned down Tagore (on account of his biscuit complexion) and who elected in his stead to their august cropse, Alice Maynell and Dean Inage."

ততদিনে রবীন্দ্রনাথের প্রতি পাউন্ডের উৎসাহ কমতে শু করেছে, যা তাঁর স্বভাবের নিয়ম অনুবর্তিতায় প্রতিফলিত, যে প্রথমে একজনের সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হওয়া, তারপর তাকে ত্যাগ করে আবার নতুন একজনকে নিয়ে পড়া।

।। তিন ।।

প্রায় ৭০ বছর আগে লন্ডনে দেখা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ইয়েটস, এজরা পাউন্ডও তাঁদের কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে যাঁরা তাঁর কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর প্রতিভার ব্যাপ্তি ও অনন্যতা বুঝেছিলেন এবং সাধ্যমত তাঁর লেখা প্রচার করতে সাহায্য করেছিলেন। তারপর তাঁরা আবার তাঁদের নিজেদের জগতে ফিরে গেছেন বিশেষ করে এজরা পাউন্ড, যিনি ছিলেন এক অশান্ত ঘূর্ণি, কোনো কিছুতেই বেশিদিন স্থির থাকতে পারতেন না, রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও পারেননি। রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন ও সারা ইউরোপের পত্র-পত্রিকা যখন তাঁর প্রশস্তি ও নিন্দায় ভরে গেল, তখন এই পুরনো বন্ধুর দল সেই মত্ততায় কোনো অংশ গ্রহণ করেননি। ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথের জার্মানি ভ্রমণের সময় তাঁকে ঘিরে যে মহা আলোড়ন হল, তার 'মিস্টিসিজম'-প্রাচ্যের বাণী, তাঁর কান্তি, পরিচ্ছদ, ব্যক্তিত্ব নিয়ে যখন সাধারণ লোকের মাঝেও তিনি প্রচন্ডসাড়া জাগিয়ে ছিলেন, তখন ইয়েটস ও পাউন্ডতাতে যোগ দেননি।

প্রত্যেক মানুষই তার মতাদর্শ বা ভাবধারার পরিবর্তনের অধিকারী। যৌবনের প্রারম্ভে যে মতাদর্শে গভীর বিশ্বাসী ছিলাম, তার থেকে আজ অনেক দূরে সরে গেছি, তাই বলে সেই পুরনো মতামত অ্যালবাট্রসের মতো কাঁধে করে সারাজীবন বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে তার কোনো মানে নেই। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতি এজরা পাউন্ডের মনোভাবেরও পরিবর্তন হয়েছিল, বিশেষ করে পাউন্ডযখন এক প্রতিভার লালন থেকে আর এক প্রতিভার প্রতিষ্ঠার পিছনে ছুটতে ভালবাসতেন। এমন কি যে 'ইমেজিস্ট' স্কুল স্থাপন করেছিলেন সেই সময়ে, তাও ছেড়ে দিয়ে তিনি নতুন দিগন্তের পানে ছুটে চললেন, "Imagism

was Point in my development. Some people remained at that point. I moved on”

এমনকি পাউন্ড রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যখন উচ্ছ্বসিত, তখনও তাঁর সমালোচকের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়নি, ‘গীতাঞ্জলি’র কিছু কবিতার মধ্যে একঘেয়েমির চিহ্ দেখেছেন, যেমন ইয়েটস দেখেছেন রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা ‘unequal ’ ও ‘dull’ যদিও তিনি প্রধানত দেখেছেন ‘great beauty, এবং সানন্দে Gitanjali’-র ভূমিকা লিখলেন।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি উপলক্ষে তাঁকে ঘিরে যে মত্ততা সৃষ্টি হল, তাতে তাঁর পরম ইওরোপীয় বন্ধুরাও ব্যথিত হয়েছেন। তাই তাঁর স্মৃতি কথায় রদেনস্টাইন লিখেছেন ঃ As a man longs for wine or tobacco, so Tagore could not resist the sympathy shown to a great idealist. He wanted to heal the wounds of the world… But he got involved in contradiction. Too much flattering is as bad for a commoner as for a King. Firm and frank advice was taken in good part by Tagore, but he could not always resist the sweet syrup offered by injudicious worshippers.”

রবীন্দ্রনাথও এটা যে হবে তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে যেদিন শান্তিনিকেতনে টেলিগ্রাম পৌঁছল যে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এবং তাঁকে সেই খবর দেবার জন্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ছুটে এলেন (“ক্ষিতি টলেছে” রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য), তখন বোলপুরের সেই মহা উদ্বেলতার মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ বিষন্ন বোধ করেছেন, সেই সময়ে তাঁর কাছে উপস্থিত এডোয়ার্ড টমসনকে কবি বলেছেন ঃ “ I shall never have any peace again ”

রবীন্দ্রনাথের প্রতি ইয়েটস-এর মনোভাবও পরিবর্তিত হতে শু করল আস্তে আস্তে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যখন ইংরেজিতে কবিতালিখে রদেনস্টাইনের কাছে মাসে মাসে পাঠাতেন, তখন ইয়েটস ও স্টার্জমোর দু’জনেরই এ জিনিস পছন্দ হল না। ইয়েটস বললেন ঃ
“A poet must write in his own language. The exact meaning of words in an alien tongue eludes him. He inclines to use words and phrases which have lost their quality through overuse.”

ইয়েটস-এর এই মনোভাব বর্ধিত হল আরও যখন রবীন্দ্রনাথের সত্তরতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক স্মারকগ্রন্থ বার করার জন্য সেই কমিটির পক্ষ থেকে রদেনস্টাইন ইয়েটস-কে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলেন, তখন ইয়েটস তাঁর উত্তরে লিখলেন ঃ
“Your letter about Tagore reminds me of my sins. I did get some letters on that subject months ago, but one gets into a dream over one’s work and forgets such things. Heaven knows whether I will send them anything or not or if I do whether it will be in time. Probably I shall send nothing because I hate sending mere empty compliments and have time for nothing else.”

পরে লিখলেন ঃ “Do you remember a saying quoted by Max Mueller from an old Indian text : ‘One thing will never go out of the world, the vanity of the Saints.”

রবীন্দ্রনাথের প্রতি এজরা পাউন্ডেরও পরবর্তী মনোভাব পরিবর্তিত। সেখানে রবীন্দ্রনাথের আশাবাদের বাণী ও অধ্যাত্মবাদী জীবনদর্শন তাঁর বেশি দিন ভাল লাগেনি, কারণ মাঝে মাঝে তিনি এই জগতের গ্রাহিতার কঠিন স্পর্শে সজোরে নাড়া দিতে চান নিজেকে। তারপর পাউন্ডের হল সর্বদাই উচাটন মন। নিত্য নতুন আন্দোলন, সাহিত্য ও ব্যক্তিকে নিয়ে উত্তেজিত হওয়া তাঁর স্বভাব, অনেকটা আমাদের দেশের নজল ইসলামের মতো। সেখানে তাঁর সাহায্যের জন্য তখন চলে এসেছেন আমেরিকার মিসৌরী রাজ্য থেকে টি.এস. এলিয়ট, আউডহো থেকে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, প্যারিস থেকে শিল্পী গদিয়ের

ব্রেজেসকা। তখন তিনি জয়েসের 'ইউলিসিস' উপন্যাস প্রকাশের জন্য প্রকাশকদের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছেন, তাঁর জন্য অর্থ ভান্ডার স্থাপনের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। তার মধ্যে রয়েছে তাঁর অর্থনৈতিক মতবাদ প্রচার ও 'ক্যান্টের' পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ রচনা। তাই রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ তখন একেবারেই স্তিমিত। আবার রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সারা ইউরোপ যখন কুড়ির দশকে মেতে উঠল, তখন পাউন্ড তা সমর্থন করতে পারেননি। কবির কাব্য নিয়ে মত্ততা তিনি সহ্য করতে রাজি আছেন, কিন্তু তাঁকে মহামানব হিসেবে দেখতে নয়। তাই এই সময়ে তিনি এক চিঠিতে লিখেছেন ঃ " I had backed Tagore as literary artist, not as Messiah "

।। চার ।।

ঊনিশশো চৌদ্দ সালের গোড়ার দিকে আমেরিকা থেকে এসে লন্ডনে এজরা পাউন্ডের সঙ্গে দেখা করতে এলেন টি. এস. এলিয়ট। তাঁরকবিতাটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে পাউন্ড 'পোয়েট্রি' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠালেন যা হ্যারিয়েট মনরোর অনেক আপত্তি সত্ত্বেও প্রকাশিত হল অবিকৃত অবস্থায় ও এলিয়টকে প্রতিষ্ঠিত করল শক্তিমান কবি হিসেবে। তারপর ১৯২০ সালে পাউন্ড যখন লন্ডন ছেড়ে প্যারিসে হাজির হলেন, তখন এলিয়টকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তিনি, এমনকি, "The Egoist " পত্রিকার সহ-সম্পাদকের পদ তাঁকে যোগাড় করে দিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা "The Waste Land " এলিয়ট এই সময়েই অসুস্থ অবস্থায় সুইজারল্যান্ডে বসে লিখেছিলেন যা তিনি পাউন্ডের কাছে পাঠিয়ে দিলেন প্রকাশের জন্য। পাউন্ড সেই কবিতাকে প্রায় অর্ধেক করে ছেঁটে ও সংশোধন করে প্রকাশের জন্য পাঠালেন যে অবস্থায় আজকে তা প্রায় সব কবিতা সংকলনেই স্থান পেয়েছে এবং যা তিনি পাউন্ডের নামেই উৎসর্গীকৃত করেছেন, "Il miglior fobbro (the better craftsman ") বলে । ঠিক তেমনি সাহায্য করেছেন পাউন্ড জেমস জয়েসের সাহিত্যজীবনকে যখন তাঁকে কেউ চিনত না, ইতালির ত্রিয়েস্ত শহরে কোনোরকমে দিন যাপন করতেন, তাঁর " The Dubbliners " গ্রন্থ প্রায় পঞ্চাশ জন প্রকাশক ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন পাউন্ড তাঁর "I hear any Army" কবিতাটি " Des Imagists"সংকলনে প্রকাশ করলেন এবং 'এ পোর্ট্রেট অফ দি আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ং ম্যান' পত্রিকায় ও 'ইউলিসিস'- এর কিয়দংশ আমেরিকান 'লিটল রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। শুধু তাই নয়, আর্থিক অনটন থেকে মুক্তি পেয়ে জয়েস যাতে নিশ্চিন্তে তাঁর ক্লাসিক 'ইউলিসিস' ও 'ফিনেগ্যানস ওয়েক' লিখতে পারেন তার জন্য পাউন্ড বন্ধুদের সাহায্যে এক ট্রাসট ফান্ড স্থাপন করে তাঁকে সাহায্য করলেন। কবি ও চিত্রশিল্পী উইন্ড্যাম লুইস যেমন বলেছেন, "এজরা পাউন্ডের সাহায্য না পেলে 'পোর্ট্রেট অফ দি আর্টিস্ট'-এর লেখক কোনোদিন 'ইউলিসিস' বা 'ফিনেগ্যানস ওয়েক' লিখতে সমর্থ হতেন না।"

এজরা পাউন্ডের পরবর্তী জীবন সুপরিচিত ও খুব কশ। ইতালিতে অবস্থানকালেই তিনি তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারা অসংখ্য প্রবন্ধ ও পুস্তিকার মাঝে প্রচার করতে শু করলেন এবং আস্তে আস্তে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের প্রতি। অবশ্য এর সূত্রপাত হয়েছিল পাউন্ডের জীবনে অনেক আগে থেকেই যখন তিনি ইংলন্ডে থাকাকালীন 'নিউ এজ' পত্রিকার সম্পাদক অ্যালফ্রেড ওরেজের সংস্পর্শে আসেন, যিনি আবার অর্থনীতিবিদ মেজর সি.এইচ. ডগলাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এই মেজর ডগলাস তখন নাম করেছেন তাঁর 'সোস্যাল ক্রেডিট' আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে যার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে যে কোনো দেশের প্রকৃত দাদন-ক্ষমতা তার জনসাধারণের মধ্যেই নিবন্ধ, বিশেষ করে তাঁদের উৎপাদন ক্ষমতার ওপর। কিন্তু এই স্বাভাবিক ব্যবস্থা বিকৃত হয় তখনই যখন কিছু মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঁজি জমতে শু করে, যার ফলে তারা শ্রমের ওপর দখলদারি করে। তাঁর মতে এই কতিপয় ব্যক্তি আসলে হচ্ছে ইহুদীরা। পাউন্ড ডগলাসের এই মতবাদের ওপর ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন এবং এর সঙ্গে জড়িত করলেন সুইস অর্থনীতিবিদ, সেল্‌ভিও গেসেল-এর বা মুক্ত অর্থ-এর থিসিস। প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে পাউন্ড প্রচার করলেন যে আমাদের সব সমস্যার পেছনে অবস্থান করছে সুদ। এই কুশীদজীবীরা সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নেয় এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির মানসে অর্থের যথার্থ রূপকে বিকৃত করে। তাঁর পরের সব লেখায় ও 'ক্যান্টো' গুলিতে সুদের বিদ্ধে পাউন্ড সর্ব

াত্মক প্রতিবাদ করেছেন যাকে তিনি বলেছেন।

র‍্যাপালোতে থাকার সময়ই পাউন্ড প্রকাশ করতে লাগলেন তাঁর 'ক্যান্টো' গুলি যার দ্বিতীয় খন্ড বেরল ১৯২৮ সালে এবং তৃতীয় খন্ড ছ'বছর পরে। ১৯৩০ সালেই তিনি যে পত্রিকা সেখানে শুধু কবিতা নয়, তেজারতি ব্যবসার সাংঘাতিক ফলাফল ও ইহুদি ষড়যন্ত্রের বিদ্ধেও লিখে চললেন অবিশ্রাম। তাঁর খিচুড়ি মতবাদ আমেরিকায় মিসেস্ এলেনর জভেল্ট থেকে আরম্ভ করে সেনেটার, ব্যাঙ্কার, লেখক, সম্পাদক ইত্যাদি সবার কাছেই পাঠাতে লাগলেন এবং কোনো উত্তর না পেয়ে আরও ক্ষোভের আগুনে জ্বলতে লাগলেন। তারপর যখন ইতালিতে মুসোলিনীর নেতৃত্বে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব শু হল, যার প্রথম ধাপ হচ্ছে প্রচার যুদ্ধ, পাউন্ড তখন স্বেচ্ছায় সেই প্রচার অভিযানে যোগ দিলেন এবং ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে 'রেডিও রোম' বেতারে মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট মতবাদ প্রচার শু করলেন ইংরেজিতে। তাই ১৯৪৩ সালে আমেরিকান যুক্তরাজ্যের আদালতে তিনি অভিযুক্ত হলেন দেশদ্রোহী বলে এবং যুদ্ধশেষে আমেরিকান সৈন্যদ্বারা গ্রেপ্তার হলেন ১৯৪৫ সালে। পিসায় এক উন্মুক্ত খাঁচার মধ্যে তাঁকে আটকে রাখা হল যেখানে রৌদ্র, বৃষ্টি ও ধুলোর মধ্যে কাটাতে হল দিনের পর দিন। প্রায় ছ'মাস পরে পাউন্ডকে যখন প্লেনে করে বন্দী অবস্থায় আমেরিকায় নিয়ে অ াসা হল তখন তিনি জীবন্মৃত দেহভার, মানসিক পক্ষাঘাতে সাময়িকভাবে অক্ষম।

কিন্তু পিসার সেই গভীর নরক যন্ত্রণার মধ্যেও পাউন্ডের সাহিত্যচর্চা ব্যাহত হয়নি, তারই মধ্যে তিনি লিখে চলেছেন তাঁর অন্যতম প্রধান সৃষ্টি, যেখানে অনেক বিষয়ের মধ্যে বর্ণনা করেছেন মানুষের জান্তব মনোবৃত্তি, জন্তুর মহৎ মনোভাব, ক্যাে ম্পর জীবন, নির্বাসিতের আত্মকথা ও যৌবনের স্মৃতিচারণ। আমেরিকায় তিনি দেশদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত হয়েও ম ানসিক ভাবে বিচারের সম্মুখীন হতে অসমর্থ বলে যখন সাব্যস্ত হলেন, তখন তাঁকে ওয়াশিংটন ডি সি-র সেন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে আটক রাখা হল দীর্ঘ বার বছর। কত নামী অনামীজন অ্যাটর্নি জেনারলের কাছে আবেদন করেছেন প াউন্ডের মুক্তির জন্য এই সময় । টি. এস. এলিয়ট্ অসংখ্য চিঠি লিখেছেন, হেমিংওয়ে তার মুক্তির খরচের জন্য চেক্ পা ঠিয়েছেন, রবার্ট ফ্রস্ট নিজে কোর্টে গিয়ে ছুটোছুটি করেছেন। অবশেষে ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে যখন তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল, এজরা পাউন্ড তখন স্ত্রী ডরোথীকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন তাঁর প্রিয় ভূমি ইতালিতে, আল্পস্ পর্বতের সানুদেহ মোরানোর শহরতলিতে। এই ইতালিতেই তিনি তাঁর অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাবেন স্থির করলেন যেখানে ব্রাউনিং ভেনিসে, কীট্স্ রোমে ও শেলী লেগ্হর্নের অদুরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ১৯৬৯ সালের গ্রীষ্মকালে পাউন্ড শেষবারের মতে া আমেরিকা ঘুরে ফিরে গেলেন ভেনিস শহরে যেখানে দিনের পর দিন নীরব, স্থির হয়ে বসে থাকতেন ঘরের মধ্যে, কখনো বা বাড়ির বাগানে গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পায়চারি করতেন, দান্তের মতো চোখের দৃষ্টি তখন দূরের ধূসর স্বর্গপানে।

১৯৭২ সালের ১ নভেম্বর তাঁর সাতাশি বছর জন্মতিথির দুদিন পরে মৃত্যু এল ঘুমের মধ্যে, যখন মর্ত্যজগতের সব কাজ তাঁর শেষ হয়ে গেছে, যখন শেষ বৈঠা বেয়ে নৌকো ঘাটে এসে পৌঁছেছে।

।। পাঁচ ।।

এজরা পাউন্ড অত্যন্ত জটিল চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জীবন দৈনন্দিন ব্যবহার ও সাহিত্য-মানস বৈচিত্র্য ও দ্বন্দ্বের সম াহারে ভরা। নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যৌবনের প্রারম্ভে অদ্ভুত ধরণের সাজ-পোশাক পরতেন, চিঠিপত্র ও প্রবন্ধের মাধ্যমে সর্বদাই বিতর্ক উপস্থাপন করতেন, এমনকি এক জর্জীয় ভাবাপন্ন কবিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর্যন্ত আহ্বান করেছিলেন (যার উত্তরে সেই কবি বলেছিলেন যে তাঁদের অবিকৃত কাব্য গ্রন্থ গুলি পরস্পরের প্রতি ছুঁড়ে মারা হোক।) আবার এই সময়েই যখন " " নামে কবিতা সঙ্কলন প্রকাশ করলেন, তখন সম্পাদক হিসেবে নিজের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করলেন না। আমেরিকায় থাকাকালীন সর্বদাই তিনি এই দেশের দোষ-ত্রুটি গুলিই বড় করে দেখেছেন, কিন্তু প্রবাসে গিয়ে সব সময়েই নিজেকে আমেরিকান হিসেবে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করতেন, যার ফলে সবাই তাঁকে অন্য নামে জানতো।

তণতর লেখকদের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অনেক করেছেন, কিন্তু একবার তাঁদের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে আর তাঁদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখতেন না। তাই ১৯৩৩ সালের পর তাঁর প্রধান 'প্রটেজে' হেমিংওয়ের সঙ্গে আর কোন পত্রাল াপ হয়নি, যেমন কোন যোগাযোগ হয়নি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৯১৩ সালের পর থেকে।

কিন্তু এজরা পাউন্ডের অবদান তাঁর চরিত্রের বৈসাদৃশ্যে নয়, তাঁর সাহিত্যের অনন্যতায়, তাঁর কাব্যের বিশাল পরিধিতে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের তিনি সমগোত্রীয়। কবি অডেন যেমন বলেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর সব জীবিত কবিদের লেখাতেই সচেতন বা অচেতন ভাবে এজরা পাউন্ডের প্রভাব পড়েছে, তাঁর আবির্ভাব না হলে এ শতাব্দীর সাহিত্যেরই দৈন্য হত। ত াই রবীন্দ্রনাথ যখন 'পরিচয়' পত্রিকায় ''আধুনিক কাব্য'' আলোচনা করলেন, তখন এলিয়ট ও এজরা পাউন্ডের কবিতা বিশ্লেষণ করেছেন। অনেকেই আধুনিক কবিতার নিদর্শন হিসেবে বেছে নেয় পাউন্ডের বিখ্যাত ''In a station of the metro '' নামক 'ইমেজিস্ট' কবিতাটি যার দু লাইন হল ঃ

"The apparition of these faces in the crowd : Petals on a wet, black bough"
পাউন্ডের 'Personae ', 'Lustra ' ও 'Pisan Canto '-এর কবিতাগুলি বিশ্ব সাহিত্যের উজ্জ্বল সংযোজন। সেখানে কা ঠিন্যের সঙ্গে কোমলতা, স্নিগ্ধতার সঙ্গে সহজতা মিশিয়ে যে অপূর্ব কবিতা রচনা করেছেন, আমাদের মানসপটে তা জাগক থাকবে দীর্ঘকাল। সেখানে তাঁর জীবনের সব ব্যর্থতা, তিক্ততা ও ভাবনা কবিতার অমর ভাষায় প্রবাহিত হয়েছে, সেই ক াব্যের জগতে তিনি সম্রাট, নোবেল প্রাইজ না পাওয়ার ক্ষোভ সেখানে তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি (ইয়েটস্ এলিয়ট, হেমিংওয়ে সবাই যা পেরেছিলেন)। সেখানে তিনি কনফুসিয়াসের উত্তরসাধক, দান্তের সুহৃদ ও ইওরোপীয় 'ত্রোবাদুর' ঐতিহ্যের সার্থক বাহক।

রবীন্দ্রনাথের কবি মানস তিনটি প্রধান ধারায় পুষ্ট হয়েছে যা হল ঔপনিষদিক, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ সাহিত্য ও পাশ্চাত্য সম াজের ভাবধারা। কিন্তু সব থেকেই তিনি যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু গ্রহণ করেছেন, কোন ভাবধারারই দাসে পরিণত হননি। আবার যা নিয়েছেন, আত্মকরণের দ্বারা ফিরিয়ে দিয়েছেন তার থেকে অনেক বেশি - 'সহস্র গুণম্ উৎস্রষ্টুম্ আদত্তে হিরস, রবি'। তাই তাঁর কবিতার সহজ সৌন্দর্য-এ ইয়েটস্, এজরা পাউন্ড ও আঁদ্রে জিদ যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন একদা, তেমনি পরবর্তীকালে ভারতের শাশ্বত বাণীর প্রকাশের দ্বারা আকৃষ্ট করেছিলেন রোমা রোলাঁ ও কাউন্টস্ কাইজারলিংকে। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর একাত্মতা, মানুষের আনন্দময় রূপের প্রতি তাঁর আসক্তি, জীবনের সবকিছু ভন্ডামি ও কৃত্রিমতার প্রতি তাঁর আবেগময় ধিক্কার, তাঁর সাহিত্যকে উইল্ ডুরান্ড্ বলেছিলেনঃ ''আপনার আবির্ভাবের আগে আমরা ভেবেছিলাম যে সব আদর্শ মিথ্যা ও সব আশাই বৃথা। কিন্তু আপনার দিকে একবার তাকালেই আমরা বুঝতে পারি আমরা ভুল করেছি, যে ন্যায় শক্তির ও পশু শক্তির মধ্যের যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি, যে জীবনের এমন একটি অর্থ আছে যা আমাদের মৃত্যুতেই সমাপ্ত হবে না। আপনার কবিতার সুর ও মাদকতার ফলে এবং আপনার রাজকীয় জীবনের উদাহরণের দ্বারা প্র াচ্যের অতীত আদর্শের কিছুটা আমাদের রক্তের মধ্যেও মিশ্রিত হয়েছে।

তাই এডোয়ার্ড টম্সন্ যখন রদেনস্টাইনকে লেখেন যে, ''Tagore has been unlucky in this – so far as the English influence on his work goes he belongs to the Tennysonian age, but he has the misfortune to come up for judgment by the age of T.S. Eliot and Aldoux ড্র্ত্তব্দপ্তুন্দ্বস্তু ড্রন্দ্ব ভ্রঙ্গু'ব্ধ ঞ্চব্দব্ধ ন্দত্তব্দব্ধনন্তুন্দ ত্র্সভ্র — ত্র্সব্ধড়ন্দব্ধ স্তুত্র্সত্তুপ্তুস্তু ঞ্চব্দব্ধ ড়নপ্প ন্দত্তব্দব্ধনন্তুন্দ. '' তখন রবীন্দ্রনাথকে তিনি ভুল যাচাই করেছেন, কারণ এক প্রতিভা কখনো আর এক প্রতিভাকে উৎপাটিত করে আসন গ্রহণ করে না, বিশ্বসাহিত্যের দরবারে দুজনেরই আসন সমান ভাবে পাকা। এ যেন ইয়েট্স্ না এলিয়ট্ কে বড় কবি সেই নিরর্থক আলোচনায় মাথা ঘামানো, এ বিতর্ক থামিয়ে দেখা উচিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান কতখানি। সেক্ষেত্রে সাহিত্যের যে কোন মানদন্ডেই রবীন্দ্রন াথের অবদান সর্বব্যাপ্ত, চিরায়ত, এবং একান্ত মৌলিক। এটা সত্যি যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কাঠিন্যবোধ কম, যা কিছু তির্যক, যা কিছু কৌণিক, তিনি তাকে আত্মসাৎ করে মধুর, মোলায়েম ভাবে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সে হল তাঁর প্রতিভার

বিশেষ স্পর্শ, তাঁর সাফল্যের যাদুকাঠি, তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। তাই রবীন্দ্রসাহিত্যে জীবনের অন্ধকার দিনগুলির খোঁজ করা বৃথা, কারণ যা কিছু শুভ, যা কিছু মঙ্গল, তিনি তাঁরই গান গেয়েছেন, ভয়াবহতার বদলে দ্রের দক্ষিণ মুখই তিনি দেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ হলেন আমাদের জাতীয় সম্পদ, আমাদের ''প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি''। তাঁকে বাদ দিলে আজকের বাঙালি জীবন কল্পনা করা যায় না, যেমন ভাবা যায় না ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাস। কিন্তু সময় তো এগিয়ে গেছে অনেক, যেমন জটিল হয়েছে আমাদের দৈনন্দিন অস্তিত্ব। তাই আজকের কবিরা রবীন্দ্রনাথের মতো কবিতা লিখতে পারেন না, আজকের কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতার পার্থক্য যোজন সমান। তাই বলে কি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমরা এখন পড়ি না বা পড়তে ভুলেছি? বরঞ্চ তাঁর সাহিত্যের আবেদন আমাদের কাছে কমার বদলে ক্রমশই বেড়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সুরেই আমরা বর্ষার মেঘমেদুর আকাশের দিকে তাকাই, বসন্তের আবাহনবার্তা শুনতে পাই, শরতের প্রসন্ন দিনের স্বপ্ন দেখি। আজ বাঙালি জীবন যত বেশি সংকুচিত হয়ে পড়ছে, ততই বেশি যেন আমরা রবীন্দ্রনাথকে আঁকড়ে ধরছি, ততই তাঁর সাহিত্যের শান্ত কোমল দিকগুলির মধ্যে ডুবে থাকতে চাইছি, আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে স্থান কাল ভুলতে চাইছি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমরা যত বেশি মেতে উঠছি, পাশ্চাত্যের সমাজ ততই তাঁকে ভুলে যাচ্ছে। এর সূচনা দেখা দিয়ে ছিল তিরিশের যুগের শেষের দিক থেকেই যখন ইউরোপ-আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের বইয়ের কাটতি এতো কমে গেল যে তাঁর বহুদিনের প্রকাশক ম্যাক্‌মিলান্‌ কোম্পানী অবধি আর তাঁর বই প্রকাশ করতে চাইল না। প্রথম মহাযুদ্ধের নিহত সৈন্যদের প্রিয়জনেরা যেমন 'গীতাঞ্জলি'র কবিতার মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজতো, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মৃত ব্যক্তির আত্মীয়রা শান্তি পেতো খালিল জিব্রানের 'দি প্রফেট্‌' গ্রন্থের মধ্যে। তাই ষাটের যুগের হিপি আন্দোলনের সুবর্ণ দিনে পশ্চিমের এক বৃহৎ আদর্শবাদী তণ সমাজ যখন জড় সভ্যতার সব আবেদন ছেড়ে প্রকৃতির সহজতার মধ্যে ফিরে যেতে চাইল, তখন তাদের কাঁধের ক্যান্‌ভাস্‌ ব্যাগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কোন বই নেই, আছে জিব্রানের 'দি প্রফেট্‌' বা হের্‌মান হেস্‌-এর 'সিদ্ধার্থ'। তাই বলে রবীন্দ্রনাথ পুরনো বা অপাঙক্তেয় হয়ে যাননি, তাঁর সাহিত্য আজ যদি পশ্চিমী সমাজে প্রচারিত না হয়, তা হলে পশ্চিমী জগৎই দরিদ্র হবে, রবীন্দ্রসাহিত্যের মানবিক মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত হবে। বিশাল মানস সরোবরের 'দুর্গম' সেই পথে তীর্থযাত্রা না করলে জীবনই অপূর্ণ থেকে যাবে, মানস সরোবরের তাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

জীবনের সব আঘাত, সব নির্যাতন পাউন্ডকে করে তুলেছে নৈরাশ্যবাদী, নিঃসঙ্গ। যৌবনের সেই আকাশস্পর্শী আশাবাদ ও অফুরন্ত উদ্দীপনা পরিণত হয়েছে অন্ধকার হতাশায়, যেখানে দেখেছেন শুধু প্রাণের অনিকেত অস্তিত্ব, মানুষের কৃত্রিম ছলাকলা। তাই আয়ুর উপান্তে এসে পাউন্ড লিখলেন ঃ

কিন্তু জীবন-সায়াহে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ তখনও আশাবাদী, কঠিন সত্যেরে ভালবেসে মান-অভিমান, দুঃখ-বঞ্চনা সব হাসি মুখে নিতে প্রস্তুত। তাই মৃত্যুর তিন মাস আগেও লিখে গেলেন ঃ

রূপ-নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম.....।
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়,
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালবাসিলাম -
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা ও জীবন -

সত্যের দাণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।।
(“শেষ লেখা”, তেরই মে, ১৯৪১)

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com